ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ সংশয় কাটছে না সদানন্দর। কারণ যে রানিমাকে দেখে তার মনে হচ্ছে ছোটবেলার বন্ধু কড়ি, সেই মহিলা কিন্তু সদানন্দ যে তাঁর পূর্বপরিচিত এমন কোনও আভাসই দিচ্ছেন না। একেবারে সরাসরি সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন মাস্টারমশাই, কত টাকা চাই? তবে কি কোথাও ভুল হচ্ছে সদানন্দর! তবু মরিয়া হয়ে জানতে চাইল রানিমাই বাতাসপুরের অমৃতা কিনা। এবার রানি এক চিলতে হেসে বললেন, যাকে আপনি কড়ি বলে ডাকতেন?

১২

যাকে সেদিন প্রাণে বাঁচিয়েছিল, বিধির কী আশ্চর্য বিধান – তার কাছে আজ নিজেই প্রার্থী হিসেবে এসে দাঁড়িয়েছে। কী দরকার? প্রয়োজনটা সদানন্দর ব্যক্তিগত কিছু নয়। পেশাগত, বড়জোর সামাজিক একটা দায়। পাঁচজনের সহযোগিতায় নিশ্চয় কাজটা হয়ে যাবে। কৃপাপ্রার্থী হিসেবে নয়, বরং আজ রানির সামনে রাজার মতো মাথা উঁচু করেই দাঁড়াবে। দাঁড়াতে চায়।

হঠাৎ সদানন্দ বলে ফেলল, স্কুলের যে ব্যাপারটার জন্য এসেছি, সেটা নিয়ে তোমার অত ভাবার কিছু নেই। অনেকেই এগিয়ে আসছেন, ঠিক হয়ে যাবে।

অমৃতা হাসল, হ্যাঁ, হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে থাকো। স্কুলের ওই ঘর দু'টোর দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু প্রতিদানে আমারও কিছু দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। এ বার আর ছাড়ছি না।

– মানে? চমকে উঠল সদানন্দ।

– থাক এখন। সব বলব। পরে। অত তাড়া কীসের?

– দায়িত্ব মানে! কোনও সমস্যা?

– হ্যাঁ। টাকাপয়সার কিছু সমস্যা আছে। বললাম তো, পরে বলব।

বড় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে সদানন্দ। অতি উৎসাহে সে বলে, কিছু ভেব না। ও সব আবার কোনও সমস্যা? আমার বিস্তর টাকা জমে গিয়েছে। তোমার কোনও অসুবিধে হতে দেব না। পুরোনো কথাগুলো আমি ভুলিনি, কড়ি।

– আমিও ভুলিনি। ভুলতে পারিনি। কিন্তু সমস্যাটা টাকার অভাবের নয়। বাড়তি থাকার সমস্যা। অতিরিক্ত হয়ে যাবার সমস্যা। সব বলব। আজ নয়। আজ শুধু তোমার কথা শুনব। ছেলেমেয়ে ক'টি! কী পড়ছে–টড়ছে। মিসেস?

উত্তর না দিয়ে সদানন্দ অপলক চেয়ে আছে। অমৃতা আবার শুধোয়, বিয়ে করেছিলে কতদিন পরে?

সদানন্দ বিড়বিড় করে, তুমি ভাবলে কী করে কড়ি, আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব! করতে পারব?

– বলছ কী! দূরের সোফা থেকে অমৃতা কাছে এসে বসে, বিয়েথা করনি নাকি আজ পর্যন্ত? আশ্চর্য! চুলগুলোকে পাকিয়ে ফেললে যে! কেন?

– যে ডাক দিয়েছিল, তার অপেক্ষায় বসে আছি। থাকবও।

– পাগলামি কোরো না। কপট তিরস্কারের সুরে অমৃতা বলে, ইয়ার্কি করছ নাকি! সত্যি বল তো, তোমার ফ্যামিলি এখন কোথায় আছে। তোমার স্কুল যেখানে, সেই গ্রামেই, নাকি দেশের বাড়িতে!

– বললাম তো! না, বিয়ে করিনি। করার কথা ভাবিনি।

– যদি এটা রসিকতা না হয়, খুব ভুল করেছ। অন্যায়।

– তুমি কোনও অন্যায় করনি তো, কড়ি?

– করেছি। অনেক অন্যায় করেছি। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। ভুগছি। তুমিও কি তাই চাও? ভুল করবে আর ভুগবে?

সদানন্দ অমৃতার হেঁয়ালি ভরা কথার সবটা ধরতে পারে না। ও কি অন্য কথা কিছু বলতে চায়? আজ জীবনের প্রায় প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে সত্যিই কি দু'জনে কিছু সাহস আর স্পর্ধা দেখানোর জন্য প্রস্তুত! থাক গে, সে সব বিষয় তুলে পরিবেশটাকে ভারী করে তুলতে চায় না সদানন্দ। সম্ভবত অমৃতাও।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করল, তোমার তো একটিই মেয়ে? এখানে আর কেউ নিজের বলতে নেই? মেয়ে কোথায়?

– শান্তিনিকেতনে। এম.এ পড়ছে। ইংরেজি নিয়ে। হস্টেলে থাকে।

– তা হলে তুমি এখানে! একেবারে একাই?

– কেন? কত কাজের লোকজন দেখতে পাচ্ছ না? সবাই রানিমা বলে খুব মানে। কোনও অসুবিধে নেই। কত বড় বিপদ গেল, এরাই তো সামলে দেয়।

– বিপদ?

– হ্যাঁ। অনেক বিপদ। কত ঝড়ঝাপটা। এই তো সেদিন – আমি গিয়েছিলাম টাপুরের কাছে। রাতটা থাকতে হয়েছিল, ব্যস বিরাট ডাকাতি হয়ে গেল। আমাদের সব লোকজনকে বেঁধে রেখে বন্দুকপিস্তলধারী ডাকাতের দল সারারাত ধরে গোটা বাড়ি তছনছ করে চলে গেল। তার পর থেকেই তো আর্মড গার্ড রেখেছি।

– তা হলে তো তোমার সব শেষ। সবকিছু নিয়ে চলে গেল?

হাসল অমৃতা, পারেনি। কিছু কাঁসাপিতলের বাসনপত্র আর আলমারির লকারে রাখা সামান্য কিছু গয়নাগাঁটি। টাকাকড়ি কয়েক হাজার মাত্র।

– উরিব্বাস! সেটা কি কম হল? সামান্য গয়না বলছ কেন? তোমাদের তো রাজবাড়ি। বিস্তর নামডাক।

– সব সামলে রেখেছি। অনেকটাই বহরমপুর আর কলকাতার দু'টো ব্যাংকের লকারে। এখানে থেকে গিয়েছিল কিছু ... থাক, পরে সে সব বলব। যাক গে, আমার আর ভয়টয় করে না। অনেকদিন তো হল, মাথার উপর ছাতাহীন জীবন। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সবকিছু মোকাবিলা করবার শক্তি ঠিক পেয়ে যাই। এই দেখ, শুধু বাজে বকে চলেছি। পরে কথা হবে। তুমি ... ওই যে ওদিকে টয়লেট, চানটান করে ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলি।

সদানন্দ বাধা দিল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না কড়ি। গঙ্গার জল এখন দারুণ, একেবারে টলমলে। আসবার সময় রিকশা থেকে নেমে সাঁতার কেটে স্নান করলাম। সেই জালালাদিঘির মতো কালো জল। মানমলজির বাড়িতে একপ্রস্ত আহারও হয়েছে। আমাকে তো ফিরতে হবে।

– ফিরেই তো এলে। আবার যাবে কোথায়? কে সেখানে তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে? ফেরার কথা ফেলে দাও। এবার এগোনোর পালা। সামনের দিকে।

– তোমার কথাগুলো কেমন হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়াটে। বোঝা মুশকিল। আমি এগোতে চাই না কড়ি, বিশ্বাস করো। সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলোতে ফিরতে চাই। পারব না?

– জানি না। পিছোবার কথা তো ভাবিনি কোনওদিন। আমি চাই সামনের দিকে পা ফেলতে। পথটা ডাকে। ভালোমন্দ ভাবি না। এগিয়ে চলাতেই আমার আনন্দ।

সদানন্দর কোনও আপত্তি মানল না অমৃতা। দুপুরটা থেকে যেতেই হল। দুপুর দু'টো পঞ্চাশ নাগাদ এটা ট্রেন আছে গঙ্গার ওপারে আজিমগঞ্জ থেকে। অন্তত ঘণ্টাদেড়েক আগে না বেরোলে স্টেশনে পৌঁছোনো মুশকিল ঠিক সময়ে। নৌকাতে নদী পেরোনোর ঝামেলা আছে। গ্রীষ্মের চড়া রোদের দুপুরে মাঝিরা থাকবে কিনা কে জানে!

এরপরে শিয়ালদহ–লালগোলা লাইনে অবশ্য এপারেও ট্রেন আছে। কিন্তু লালগোলা পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে যাবে। সেখান থেকে দ্বীপচর যাওয়া বেশ ঝামেলা।

অমৃতা ছোটবেলাতেও একটু জেদি ধরনের ছিল। দেখা যাচ্ছে এখনও বদলায়নি। সদানন্দকে ওরা জবরদস্তিটা মেনে নিতে এল। এখন যদি রাতেও থেকে যেতে হয় তা হলেই কেলেঙ্কারি। যা হওয়ার তা হবে।

খাবার ঘরে ঢুকে সদানন্দ দেখল, এলাহি আয়োজন। মাত্র দু'আড়াই ঘণ্টায় এত রান্না করল কে? অমৃতা তো অধিকাংশ সময় তার সঙ্গেই ছিল। রান্নাবান্নার লোক কতজন? শ্বেতপাথরের বিশাল টেবিলে চারখানা গদিআঁটা মেহগনি কাঠের চেয়ার। মাত্র একটার সামনে খাবার সাজানো।

সদানন্দ অমৃতার দিকে চোখ তুলে বলল, তোমারটা কই! খাবে না?

অমৃতা হাসল, অতিথির তদারকি না করে বসি কী করে? বিলেতি কায়দা শিখতে পারিনি। এখন সবে একটা। তোমাকে রাতে এখানে থাকতে বললে বোধহয় হার্টফেল করবে। ঠিক সময়ে ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে হবে তো! দুপুরবেলা আমার খেতে দু'টো–আড়াইটে হয়ে যায়। তা ছাড়া ভুলে গিয়েছে – তোমার জন্যে যা ব্যবস্থা, সেই আমিষ কি চলবে? ব্রাহ্মণের বিধবা। বিশুদ্ধ নিরামিষ। সেটাই তো উচিত, কী বল।